DHARA

ACADEMIC MAGAZINE

Vol. 5 (2022-23)

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

KHALISANI MAHAVIDYALAYA

আমি অত্যন্ত আনন্দিত খলিসানি কলেজের ভূগোল বিভাগ আগামী 21.06.2023 তারিখে তাদের বিভাগীয় প্রত্রিকা 'ধারা' (e-magazine) প্রকাশ করতে চলেছে। ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকাটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধা বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করছে ও ভবিষৎ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এই পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আমি এই পত্রিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সার্বিক সাহায্য , সহযোগিতা ও সব সময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

তারিখ : 17.06.2023

ডঃ অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ
খলিসানি কলেজ
চন্দননগর, হুগলী

আমি খুবই আনন্দিত যে খলিসানি কলেজের ভূগোল বিভাগের ই-ম্যাগাজিন 'DHARA' ‘ধরা’ র সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে ।এই ম্যাগাজিন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ,শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অন্যান্য গবেষক ও লেখকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে । আই.কি উ.এ.সি. র সংযোজক হিসাবে আমি এই জন্য গর্বিত ও আনন্দিত।এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক, সম্পাদকমন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই ম্যাগাজিনের উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ।

তারিখ : 17.06.2023

অজন্তা চক্রবর্তী
সংযো জক
অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ সেল
খলিসানি কলেজ
চন্দননগর, হুগলী

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের যথোপযুক্ত করে তোলা। শিক্ষা জীবনের মহৎ সংকল্পই হলো নিজস্ব মানসিক চিন্তার পটভূমিকা লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটানো। তাই খলিসানি মহাবিদ্যালয় এর ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশের এই প্রয়াস।

“DHARA’ "ধরা' এর সংখ্যা প্রকাশ হলো। ভূগোলের আঙিনায় অভিনব তথ্য ও তথ্যের সমাহার এই সংখ্যা। আমাদের ভৌগোলিক বোধের ও মননের দর্পন ধরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারায়ও মহাবিদ্যালয় এর নিয়মিত প্রবাহকে বজায় রাখতে পারায় আমি যথেষ্ট আনন্দিত। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এই প্রকাশনের সাথে যুক্ত সকলকে বিশেষ করে এই সংখ্যার সাথে যুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি এবারের "ধরা" উৎকর্ষতার মানে ও আমাদের ভালোবাসায় সবার কাছেই সাদরে গৃহীত হবে এবং এটি মহাবিদ্যালয় এর কার্যাবলীর একটি মূল্যবান নথি হয়ে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে ,

তারিখ : 17.06.2023

ডঃ কুন্দন কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান
ভূগোল বিভাগ
খলিসানি মহাবিদ্যালয়
চন্দননগর, হুগলি

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই সকল ব্যক্তিত্বের প্রতি যারা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলী কে সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করে চলেন। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মহাশয়, অধ্যক্ষ মহাশয়, অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ সেলের সংযোজক, বিভাগীয় প্রধান মহাশয়, সকল সহকর্মী বৃন্দ ও সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ , 'DHARA' কে আর ও দৃঢ় চেতনায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য । আশা রাখি 'DHARA' সকলের মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে । আপনাদের সকলের সহযোগিতা , শুভেচ্ছা ও ভালো বাসা আমাদের বিভাগীয় পত্রিকার চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠুক এই কামনা করি ।অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি কিছু থাকলে মার্জনা করবেন। সর্বশেষে বিভাগীয় শিক্ষক হিসেবে 'DHARA' কে জানায় আমার হার্দিক অভিনন্দন ও সামনের পথে এগিয়ে চলার অদম্য উৎসাহ।

শুভেচ্ছান্তে ,

তারিখ : 17.06.2023

ডঃ শুভেন্দু রায়
সহকারী অধ্যাপক
ভূগোল বিভাগ
খলিসানি মহাবিদ্যালয়
চন্দননগর, হুগলি

সম্পাদকীয়

অদম্য উৎসাহ আমাদের সকল বাধাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে , আমরা আমাদের প্রয়াসকে সফল করতে পেরেছি এবং তা সম্ভব হয়েছে শিক্ষিকা, সহকারী কর্মচারী ও ছাত্র ছাত্রীদের আন্তরিক সদিচ্ছা , সর্বাঙ্গীন সহায়তায়। বিভাগের প্রত্যেকের আন্তরিক মধুর গভীর সম্পর্ক আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পাথেয়।

তারিখ : 17.06.2023

সোমাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
ম্যাগাজিন প্রকাশনা মন্ডলী
ভূগোল বিভাগ
খলিসানি মহাবিদ্যালয়

সূচিপত্র

সাংস্কৃতিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কথা - অজন্তা রায় চৌধুরী 1

বাংলার প্রথম নির্ভুল মানচিত্রের ইতিহাস - ডঃ কুন্দন কুমার দাস 5

SAHARA: THE BIGGEST TROPICAL DESERT ON EARTH - সুদীপ্ত দত্ত (প্রাক্তন ছাত্র) ভূগোল বিভাগ 8

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - সোমাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কুশ কুমার পাইক, কঙ্কনা বায়েন (সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ) 14

কৃষক চায় না কৃষিকাজ (ভারতে) - রনি দাস (সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ) 18

গ্লোবাল ওয়ারমিং - ঈশিতা মুখার্জী, স্বর্ণালী সাধুখাঁ, সৌমিলি বিশ্বাস, তৃপ্তি সাঁতরা (সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ) 20

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা – বিদিশা হলদি, তারক পাল (সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ) 23

ভারত –রিসব সাঁতরা (দ্বিতীয় বর্ষ সাধারণ) 26

মহামারী - আসমাতারা খাতুন (সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ) 32

সাংস্কৃতিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কথা

অজন্তা রায় চৌধুরী
SACT, ভূগোল বিভাগ

মানবীয় ভূগোল হল সমাজ বিজ্ঞানের সেই শাখা যা মানুষের সমাজ, জীবন ও জীবিকার ধরন এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের অভিযোজন ও আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা করে। জনবসতির আঞ্চলিক বন্টন, সমাজ ও সংস্কৃতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে মানবীয় ভূগোল। ভিদেল দ্য লা ব্লাশ (1918) বলেছেন "মানবীয় ভূগোল পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক সে সম্পর্কে এক নতুন ধারনা প্রদান করে।"

আমার আলোচ্য বিষয় সাংস্কৃতিক ভূগোল (Cultural Geography) এই মানবীয় ভূগোলের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত একটি বিষয়। সাংস্কৃতিক ভূগোলের আলোচনার এই পরিসরে প্রথমেই সংস্কৃতি বিষয়ে একটু আলোকপাত করে নেওয়া দরকার।

সংস্কৃতি :-

বাংলায় সংস্কৃতিকে কৃষ্টি বলা হয়। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ষণ বা চাষ। তাহলে সংস্কৃতির অর্থ কি? এই প্রশ্ন করার সাথে সাথেই একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। সংস্কৃতির ভিত্তিমূল দুটি। যথা জীবিকা প্রয়াস ও শ্রমশক্তি। মূলত, সংস্কৃতি এমন একটা রূপ যা শুধু জীবন-সম্পৃক্ত হলেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। সংস্কৃতি জীবন চর্চার মধ্যে এমন গুণ যা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তাকে দৃষ্টি গ্রাহ্য ও উপলব্ধিযোগ্য করে তোলে। মানুষ তার মননশক্তি, চিন্তাশক্তি ও সৃজনশক্তির গুনেই মানব সংস্কৃতি বিকশিত করেছে। সেজন্য ভূগোলশাস্ত্রে ও সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতির অর্থ সর্বব্যাপক।

১) সমাজবিজ্ঞানী কার্লাইল বলেছেন : The great lan of Culture is, let each become all that he was created capable of being..

২) সমাজবিজ্ঞানী রস বলেন : ‘‘Culture is the total acquired behavior patterns transmitted by imitation or instruction"

৩) টাইলর তাঁর "Primitive culture" গ্রন্থে বলেছেন Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

৪) হার্বাট স্পেনসার সংস্কৃতিকে মানুষের জৈবিক গঠনে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫) কার্ল মার্কস সংস্কৃতির ব্যখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, "অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপরি কাঠামোই (Super Structure) হচ্ছে সংস্কৃতি।" সেই জন্য তিনি মনে করেন যে, অর্থনীতিই মূলত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

৬) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, হীরক খন্ড হচ্ছে সভ্যতা, আর তার থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাই সংস্কৃতি।

৭) নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার বলেছেন, "প্রতিক্রিয়া, অভ্যাস, কৌশল, ধারনা ও মূল্য প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট ব্যবহার সংস্কৃতি গঠন করে। সংস্কৃতি মানুষের বিশেষ একচেটিয়া উপাদান।"

সংস্কৃতির গভীর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদগণ সংস্কৃতির দুটি প্রকারভেদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যথা :- ক) বস্তুগত সংস্কৃতি (Material culture) এবং খ) অবস্তুগত সংস্কৃতি (Non-Material culture)
বস্তুগত সংস্কৃতিকে পার্থিব সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। অবস্তুগত সংস্কৃতিকে অপার্থিব সংস্কৃতি বলে গন্য করা হয়।

সাংস্কৃতিক ভূগোল :-

সাংস্কৃতিক ভূগোলের সহজবোধ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সাধারন ভাবে বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক ভূগোল হচ্ছে ভৌগোলিক পঠন-পাঠনে সাংস্কৃতিক ধারনা গুলোর প্রয়োগ। সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদ সাংস্কৃতিক ধারনা গুলো প্রয়োগ করে ভূপৃষ্ঠের সব ধরনের মানবসৃষ্ট উপাদানের পারিসরিক বিন্যাসের ব্যাখ্যা করেন। মানুষ ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান শক্তি। বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষ সতত ভূপৃষ্ঠের নানারূপ পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। সাধারন (মূল) ভূগোলের মতো সাংস্কৃতিক ভূগোল ভূপৃষ্ঠের পারিসরিক বা আঞ্চলিক পৃথকীকরণ বিষয়গুলি উপলব্ধি করে, সেগুলো ব্যাখ্যা করে এবং এই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সাংস্কৃতিক ভূগোলবিদগন সাংস্কৃতিক ধারনা গুলো প্রয়োগ করেন।

সাংস্কৃতিক উদ্ভব, বিকাশ, যুগ ও এলাকা ভেদে মানব সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ও ব্যাপ্তি সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিষয় পরিধির অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক পদ্ধতি, ঐ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আচরণ এবং পদ্ধতির আলোকে চলমান জীবন যাপন পদ্ধতি সমীক্ষা করা হয় সাংস্কৃতিক ভূগোলে। মানবজাতির বিভিন্ন কাজ, আচরণ, রীতিনীতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে মানবীয় ভূগোলের এই শাখা। মানব সৃষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় বলে "সংস্কৃতি" সাংস্কৃতিক ভূগোলের মূল বিবেচ্য বিষয়। সাংস্কৃতিক ভূগোল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ (Cultural trait) দ্বারা গঠিত "সাংস্কৃতিক অঞ্চলের" সীমা নির্ধারণ করে এবং ঐ অঞ্চলের পরিবর্তনশীল বিস্তার অনুসরণ করে।

সাংস্কৃতিক ভূগোলের ক্রমবিকাশ :-

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সাংস্কৃতিক ভূগোলের সূচনা হয়। জার্মানী ও ফ্রান্সে এর সূত্রপাত হবার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা অধিক প্রসার লাভ করে। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ কার্ল ও সয়ার (Carl O Sauer) তাঁর Morphology of Landscape (1925) গ্রন্থে বলেছেন "পৃথিবীর উপর মানুষ তার কার্যাবলীর মাধ্যমে নিদর্শন রেখে যে, সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য রচনা করেছে তাই সাংস্কৃতিক ভূগোলের পাঠ এবং আমরা বিভিন্ন ভূদৃশ্যে প্রতিফলিত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পরিবেশের সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষন করি"। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কতিপয় ভূগোলবিদ মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্কের উপর জোর দিতে শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ভূগোলের জন্ম হয়। Ratzel পরিবেশবাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। ফ্রান্সের ভূগোলবিদ ভিদেল দ্য লা ব্লাশ -এর মতে মানুষের কার্যাবলীর সিদ্ধান্ত মানুষ নিজেই গ্রহণ করে এবং তা প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। একটি মানবগোষ্ঠী তার নিজস্ব সংস্কৃতির পটভূমিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছে এবং নিজের প্রয়োজন মতো গড়ে নিচ্ছে। এই চিন্তাধারাই সংস্কৃতির উৎকর্ষতা তথা সাংস্কৃতিক ভূগোলের ভিত্তি।

সাংস্কৃতিক ভূগোলের বিভিন্ন দিক গুলি হল :-

ক) স্বাধীন উদ্ভাবন (Independent Innovation)
খ) ব্যাপন প্রক্রিয়া (Diffusion Process)
গ) সাংস্কৃতিক অঞ্চল গঠন (Formal Cultural Region)
ঘ) সাংস্কৃতিক সংহতি (Cultural Integration)
ঙ) সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য (Cultural Landscape)
চ) জনবসতির বিস্তার (Extension of Human Settlement)
ছ) ভূমি ব্যবহারের ধাঁচ (Pattern of Land Utilization)
জ) স্থাপত্যকলার বিবর্তন (Evolution of architecture)
ঝ) সাংস্কৃতিক সংযোগ (Cultural contact)

সংস্কৃতি হল সমাজের সামগ্রিক চর্চার বিষয় এবং সাংস্কৃতিক ভূগোল হল তারই একটি রূপ যার কোন সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে থাকে বোধের প্রাধান্য। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গুলির পারস্পরিক সংযোগে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য যা মানুষের শ্রম, প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বিষেশভাবে সম্পর্কিত। সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভূগোলের পরিধি তথা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। এটি পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়। তবে তা অত্যন্ত ধীরগতিতে।

তথ্যসূত্র :-

১) সমাজ ভূগোলের রূপরেখা - ড. জ্যোতির্ময় সেন
২) মানুষ ও সংস্কৃতি - ড. কাজী আবদুর রউফ ও কাজী আবুল মাহমুদ
৩) মানবীয় ভূগোল - ড. অজিতকুমার শীল
৪) Oxford Dictionary of Human Geography
৫) Dictionary of Human Geography - Dr. Jyotirmoy Sen

বাংলার প্রথম নির্ভুল মানচিত্রের ইতিহাস

ডঃ কুন্দন কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক
ভূগোল বিভাগ
খলিসানি মহাবিদ্যালয়
চন্দননগর, হুগলি

পণ্ডিতদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে কার্টোগ্রাফি এবং জরিপ মূলত ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সাথে ভারতে প্রবর্তিত পশ্চিমী উদ্ভাবন ছিল।এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে ম্যাপিংয়ের মতো সমীক্ষা ঔপনিবেশিক বিজয়ের সাথে উদ্ভূত হয়নি। মুঘল যুগে, ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার আইন-ই-আকবরী এ আবুল ফজলের "বারো সুবাহের হিসাব"-এ প্রদর্শিত আঞ্চলিক সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই বিস্তারিত উৎসের উপর ভিত্তি করে ফরাসি সেনাবাহিনীর কর্নেল জিন ব্যাপটিস্ট-জোসেফ জেন্টিল 1770 সালের দিকে ইউরোপীয় শৈলীতে ভারতের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে যা অনন্য ছিল, তা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসেবে মানচিত্র এবং জরিপগুলির বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার। নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির জন্য সমীক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আঞ্চলিক সম্প্রসারণ এবং বাংলায় তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একত্রীকরণ ভূখণ্ডের ব্যাপক সমীক্ষা এবং ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছিল । এই অর্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঔপনিবেশিক রূপান্তরকে সম্ভবত একটি "কার্টোগ্রাফিক ওয়াটারশেড" হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 1765 সালে, যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজস্ব-স্বত্ব অর্জন করে, তখন জেমস রেনেল ইউরোপীয় মডেলে বাংলার জরিপ শুরু করেন। 1802 সালে মাদ্রাজে ত্রিভুজকরণের সূচনা হয়েছিল, যার ফলে উইলিয়াম ল্যাম্বটনের দ্বারা ভারতের গ্রেট ত্রিকোণমিতিক জরিপ শুরু হয়েছিল এবং স্যার জর্জ এভারেস্ট 1843 সালে তা সম্পন্ন করেছিলেন। জেমস রেনেল নামটি আজ ক জনের মনে আছে জানি না কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই সাহেব ই প্রথম এঁকেছিলেন বাংলার প্রথম প্রামাণ্য ম্যাপ। রেনেল , ডি'আনভিল এবং ডি'অ্যাপ্রেস ডি ম্যানেভিলেটের মতো ফরাসি মানচিত্রকারদের কাজ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন । মেজর জেমস রেনেল (1742-1830), 1764 সালের এপ্রিল মাসে বাংলার সার্ভেয়ার-জেনারেল এবং 1লা জানুয়ারী 1767-এ ভারতের সার্ভেয়ার-জেনারেল হন। বিদেশী সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি সম্ভবত এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের জন্য দায়ী। তরুণ রেনেল

1756 থেকে 1763 সালের মধ্যে নৌবাহিনীতে কাজ করেছিলেন এবং একজন নৌ অফিসার হিসাবে তার প্রশিক্ষণ সম্ভবত তাকে দেশপ্রেমিক অনুভূতির সাথে সাথে ভূগোলের প্রতি তার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। নৌবাহিনীতে থাকাকালীন, রেনেল প্রাথমিকভাবে মেরিন সার্ভেয়িংয়ে নিয়োজিত ছিলেন যা বাংলার নদী নিয়ে তাঁর কাজের প্রতিফলিত হয়েছিল।

বাংলায় তাঁর প্রথম কাজটি ছিল গঙ্গা নদী জরিপ করা যাতে কলকাতা থেকে উপদেশীয় যানবাহনের জন্য একটি জলপথ খুঁজে পাওয়া যায় যা সারা বছর ধরে চলাচলের উপযোগী । রেনেল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের বড় নদীগুলিকে দেশের ভূগোলের "চাবিকাঠি" হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তাই, বছরের পর বছর , তিনি মহান নদী-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছেন, প্রতিটি বর্ষার প্রবল বন্যায় তাদের আচরণ দেখেছেন, তারা জমা হওয়া নতুন পলি দ্বীপগুলি পরিমাপ করেছেন এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় তাদের পরিবর্তিত গতিপথ ম্যাপ করেছেন । সার্ভেয়ার-জেনারেলের সদর দপ্তর ঢাকায় ছিল । সার্ভেয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকা একটি সুবিধাজনক কেন্দ্রীয় অবস্থানে অবস্থিত ছিল এবং ফ্লুভিয়াল হাইওয়েগুলির একটি নিখুঁত নেটওয়ার্ক দ্বারা বেষ্টিত ছিল, শহরটি নিজেই বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। 1764 সালের এপ্রিল থেকে 1765 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, রেনেল জলঙ্গী থেকে সমুদ্র এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে গোয়ালপাড়ার 20 মাইলেরও বেশি গঙ্গা ও আরও কয়েকটি উপনদী নদীর উপরে একটি বিশদ জরিপ সম্পন্ন করেন ।

রেনেল প্রাথমিকভাবে 1764 সালের শরৎ থেকে শুরু করে গঙ্গা নদী নিয়ে জরিপ করেছিলেন, 1766 সালে তিনি টারটারিয়ান পর্বত (হিমালয়) জরিপ করেছিলেন। সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা থেকে উত্তরাঞ্চলে একটি নৌ-পথ খুঁজে বের করা। ভুটান সীমান্তে যখন জরিপকারীদের দল সন্ন্যাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন রেনেল প্রায় নিহত হন। তিনি গুরুতরভাবে আহত হন, তাকে নৌকায় করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়, এ যাত্রায় ছয় দিন সময় লেগেছিল। তিনি কখনই তার ডান হাতের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা অর্জন করতে পারেননি।

রেনেল তার অ্যাটলাস অফ বেঙ্গল-এ 510টি জলপথের বর্ণনা করেছেন। তার অভ্যন্তরীণ নৌচলাচলের মানচিত্রে, রেনেল বারমেসে নদীগুলির জন্য চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি নৌচলাচলযোগ্য ছিল এবং যেগুলি শুধুমাত্র বৃষ্টির সময় চলাচলযোগ্য ছিল সেগুলির জন্য পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন । নির্দিষ্ট কিছু নদীকে জোয়ার হিসেবেও নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে জোয়ার ছিল ন্যাভিগেশনের সক্রিয় এজেন্ট। রেনেলের বুক অফ রোডস ইন বেঙ্গল এবং বিহার কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য একটি দরকারী গাইড হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বইটিতে চারটি প্রধান শহর কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা

এবং ঢাকা থেকে বিকিরণকারী রাস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের দূরত্ব , নদী ও নালাগুলির নাম এবং সেইসাথে নদী ও ফেরিগুলির বিবরণ দেওয়া ছিল।

মেজর জেমস রেনেল তার ব্যাপক জরিপের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বেঙ্গল অ্যাটলাস (1780) ছিল তাঁর বেঙ্গল ম্যাপ তৈরির ফলস্বরূপ প্রধান প্রকাশনা যা ছিল ভারতের প্রথম আনুমানিক সঠিক মানচিত্র। জেমস রেনেল জরিপের জন্য প্যারাম্বুলেটর (একটি ক্রমাঙ্কিত চাকা যার আবর্তন দূরত্ব গণনা করার ব্যবহৃত হয়) ব্যবহার সেনাবাহিনীর লোকদের দ্বারা মাঠে ম্যাপিং সম্পন্ন করা হয়েছিল -- এবং একটি কম্পাস ব্যবহার করেন । জরিপ কাজ কখনও কখনও বিপজ্জনক ছিল, তার জরিপ দল একটি চিতাবাঘ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং রেনেলকে তার লোকদের বাঁচাতে তার বেয়নেট ব্যবহার করতে হয়েছিল। ম্যালেরিয়া সাধারণ ছিল এবং 1771 সালে আক্রমণকারীদের একটি দলের বিরুদ্ধে অভিযানে তাকে সংক্ষিপ্তভাবে সামরিক দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

জেমস রেনেলের কার্টোগ্রাফিক জরিপগুলি একটি সিদ্ধান্তমূলক মোড় ছিল। যদিও অসুস্থতার কারণে 1777 সালে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন, রেনেল একটি পথ দেখিয়েছিলেন যা অন্যরা সাগ্রহে অনুসরণ করেছিল। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রেনেলের জরিপগুলি সঠিক ছিল। শতাব্দীর শুরুতে ত্রিভুজকরণ এবং বিশদ টপোগ্রাফিক জরিপগুলি ঔপনিবেশিক কার্টোগ্রাফিতে একটি নতুন পর্বের উদ্বোধন করেছিল । জেমস রেনেলের যুগের নিজস্ব স্থায়ী তাৎপর্য ছিল। গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র ব-দ্বীপের এই ম্যাপ বাংলা তথা ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম প্রায় নির্ভুল ম্যাপ। পুরোটাই ছিল নদী পথে একটি ভাঙা বজরা ও মুষ্টিমেয় কিছু সেপাই নিয়ে ভেসে পড়া। হাতে যন্ত্র পাতি সবই সেকেলে , অনুন্নত। তার ওপর বঙ্গ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সন্নাস্সী ফকির বিদ্রোহ। অনাথাশ্রমে বেড়ে ওঠা ভাগ্যবিড়ম্বিত জুবা বাংলায় এসে আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে। স্কেল ফিতে কম্পাস হাতে নিয়ে নবরূপে উপস্থাপন করেছিলেন এই বঙ্গ দেশকে।

1794 সালে মাইকেল টপিং গুইন্ডিতে (মাদ্রাজ) প্রথম সার্ভেয়িং স্কুল শুরু করেন। বাংলায়, গণিত এবং ত্রিকোণমিতিকেও হিন্দু কলেজ, কলকাতা এবং কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের অংশ করা হয়েছিল । জরিপের ক্ষেত্রে, মহান ত্রিকোণমিতিক সমীক্ষার উপ-সহকারী রাধানাথ সিকদার নামে একজন স্থানীয় যুবকের যোগ্যতা ও যোগ্যতা উল্লেখের দাবি রাখে। যুবকটি নিজেকে জরিপ বিভাগের কা ছে অপরিহার্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। এইভাবে শতাব্দীর পালাক্রমে জরিপ এবং কার্টোগ্রাফি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ইউরোপীয় এবং স্থানীয়দের মধ্যে একটি প্রধান সহযোগিতামূলক উদ্যোগে পরিণত হয়েছিল।

SAHARA

THE BIGGEST TROPICAL DESERT ON EARTH

Sudipta Dutta
Ex-Student, Dept. of Geography
Khalisani Mahavidyalaya

INTRODUCTION:- The **Sahara** is a desert spanning North Africa. With an area of 9,200,000 square kilometres (3,600,000 sq. mi), it is the largest hot desert in the world and the third-largest desert overall, smaller only than the deserts of Antarctica and the northern Arctic.

The name "Sahara" is derived from the Arabic word for "desert" in the feminine irregular form. The desert covers much of North Africa, excluding the fertile region on the Mediterranean Sea coast, the Atlas Mountains of the Maghreb, and the Nile Valley in Egypt and the Sudan.[8]

It stretches from the Red Sea in the east and the Mediterranean in the north to the Atlantic Ocean in the west, where the landscape gradually changes from desert to coastal plains. To the south it is bounded by the Sahel, a belt of semi-arid tropical savanna around the Niger River valley and the Sudan region of sub-Saharan Africa. The Sahara can be divided into several regions, including the western Sahara, the central Ahaggar Mountains, the Tibesti Mountains, the Aïr Mountains, the Ténéré desert, and the Libyan Desert.

MAP OF SAHARA DESERT

PHYSIOGRAPHY:- The Sahara is mainly rocky hamada (stone plateaus); ergs (sand seas – large areas covered with sand dunes) form only a minor part, but many of the sand dunes are over 180 metres (590 ft) high.[11] Wind or rare rainfall shape the desert features: sand dunes, dune fields, sand seas, stone plateaus, gravel plains (*reg*), dry valleys (*wadi*), dry lakes (*oued*), and salt flats (*shatt* or *chott*).[12] Unusual landforms include the Richat Structure in Mauritania.

Several deeply dissected mountains, many volcanic, rise from the desert, including the Aïr Mountains, Ahaggar Mountains, Saharan Atlas, Tibesti Mountains, Adrar des Iforas, and the Red Sea Hills. The highest peak in the Sahara is Emi Koussi, a shield volcano in the Tibesti range of northern Chad.

The central Sahara is hyperarid, with sparse vegetation. The northern and southern reaches of the desert, along with the highlands, have areas of sparse grassland and desert shrub, with trees and taller shrubs in wadis, where moisture collects. In the central, hyperarid region, there are many subdivisions of the great desert: Tanezrouft, the Ténéré, the Libyan Desert, the Eastern Desert, the Nubian Desert and others. These extremely arid areas often receive no rain for years.

CLIMATE:- The Sahara is the world's largest hot desert. It is located in the horse latitudes under the subtropical ridge, a significant belt of semi-permanent subtropical warm-core high pressure where the air from the upper troposphere usually descends, warming and drying the lower troposphere and preventing cloud formation.

The permanent absence of clouds allows unhindered light and thermal radiation. The stability of the atmosphere above the desert prevents any convective overturning, thus making rainfall virtually non-existent. As a consequence, the weather tends to be sunny, dry and stable with a minimal chance of rainfall. Subsiding, diverging, dry air masses associated with subtropical high-pressure systems are extremely unfavourable for the development of convectional showers. The subtropical ridge is the predominant factor that explains the hot desert climate (Köppen climate classification *BWh*) of this vast region.

Hot Tropical Desert

TEMPARATURE:- The high position of the Sun, the extremely low relative humidity, and the lack of vegetation and rainfall make the Great Desert the hottest large region in the world, and the hottest place on Earth during summer in some spots. The average high temperature exceeds 38 to 40 °C (100.4 to 104.0 °F) during the hottest month nearly everywhere in the desert except at very high altitudes. The world's highest officially recorded average daily high temperature was 47 °C (116.6 °F) in a remote desert town in the Algerian Desert called Bou Bernous, at an elevation of 378 metres (1,240 ft) above sea level.

RAINFALL:-The vast central hyper-arid core of the desert is virtually never affected by northerly or southerly atmospheric disturbances and permanently remains under the influence of the strongest anticyclonic weather regime, and the annual average rainfall can drop to less than 1 millimetre (0.04 in). In fact, most of the Sahara receives less than 20 millimetres (0.8 in). Of the 9,000,000 square kilometres (3,500,000 sq mi) of desert land in the Sahara, an area of about 2,800,000 square kilometres (1,100,000 sq mi) (about 31% of the total area) receives an annual average rainfall amount of 10 millimetres (0.4 in) or less, while some 1,500,000 square kilometres (580,000 sq mi) (about 17% of the total area) receives an average of 5 millimetres (0.2 in) or less.

FLORA IN SAHARA:-The flora of the Sahara is highly diversified based on the bio-geographical characteristics of this vast desert. Floristically, the Sahara has three zones based on the amount of rainfall received – the Northern (Mediterranean), Central and Southern Zones. There are two transitional zones – the Mediterranean-Sahara transition and the Sahel transition zone.[50]

The Saharan flora comprises around 2800 species of vascular plants. Approximately a quarter of these are endemic. About half of these species are common to the flora of the Arabian deserts.[51]

The central Sahara is estimated to include five hundred species of plants, which is extremely low considering the huge extent of the area. Plants such as acacia trees, palms, succulents, spiny shrubs, and grasses have adapted to the arid conditions, by growing lower to avoid water loss by strong winds, by storing water in their thick stems to use it in dry periods, by having long roots that travel horizontally to reach the maximum area of water and to find any surface moisture, and by having small thick leaves or needles to prevent water loss by evapotranspiration. Plant leaves may dry out totally and then recover.

Colocynth Plant

A type of Cactus in Sahara

FAUNA IN SAHARA:- Several species of fox live in the Sahara including: the fennec fox, pale fox and Rüppell's fox. The addax, a large white antelope, can go nearly a year in the desert without drinking. The dorcas gazelle is a North African gazelle that can also go for a long time without water. Other notable gazelles include the rhim gazelle and dama gazelle.

The Saharan cheetah (northwest African cheetah) lives in Algeria, Togo, Niger, Mali, Benin, and Burkina Faso. There remain fewer than 250 mature cheetahs, which are very cautious, fleeing any human presence. The cheetah avoids the sun from April to October, seeking the shelter of shrubs such as balanites and acacias. They are unusually pale.[52][53] The other cheetah subspecies (northeast African cheetah) lives in Chad, Sudan and the eastern region of Niger. However, it is currently extinct in the wild in Egypt and Libya. There are approximately 2000 mature individuals left in the wild.

Other animals include the monitor lizards, hyrax, sand vipers, and small populations of African wild dog,[54] in perhaps only 14 countries[55] and red-necked ostrich. Other animals exist in the Sahara (birds in particular) such as African silverbill and black-faced firefinch, among others. There are also small desert crocodiles in Mauritania and the Ennedi Plateau of Chad.[56]

The deathstalker scorpion can be 10 cm (3.9 in) long. Its venom contains large amounts of agitoxin and scyllatoxin and is very dangerous; however, a sting from this scorpion rarely kills a healthy adult. The Saharan silver ant is unique in that due to the extreme high temperatures of their habitat, and the threat of predators, the ants are active outside their nest for only about ten minutes per day.

Africal Silverbil

Deathstalker Scorpian

PEOPLE & CULTURE IN SAHARA:- The people of the Sahara are of various origins. Among them the Amazigh including the Tuareg, various Arabized Amaziɣ groups such as the Hassaniya-speaking Sahrawis, whose populations include the Znaga, a tribe whose name is a remnant of the pre-historic Zenaga language. Other major groups of people include-

The Toubou,Nubians, Zaghawa, Kanuri, Hausa, Songhai, Beja,and Fula/Fulani The archaeological evidence from the Holocene period has shown that Nilo-Saharan speaking groups had populated the central and southern Sahara before the influx of Berber and Arabic speakers, around 1500 years ago, who now largely populate the Sahara in the modern era.

CONCLUTION:- Desertification is an increasingly widespread problem as climate change modifies weather patterns, leaving people to deal with hyperarid conditions. The Sahara Desert is no exception, steadily growing across 11 countries and soon to cover more. Here, we take a look at the past, present and future of the Sahara, based on a 2018 study by Natalie Thomas and Sumant Nigam.

PRESENT SCENIRO IN SAHARA:- Deserts usually form in the sub-tropics due to airflow rising from the hotter equator and dropping back down around the tropics. However, scientists have observed that tropical latitudes are moving pole wards at a speed of 30 miles per decade, and thus, the deserts within are expanding.Indeed, analysis of rainfall data shows that the now-dry Sahara has been growing, covering 10% more land since records began around 1920.

Why is this happening? Natalie Thomas and Sumant Nigam, authors of the study, say that about two thirds of the change observed may be attributed to natural cycles, but the remaining, non-negligible third is due the human-driven shift in the tropics.

The result? Lake Chad, a landmark in the transitional region between the desert and the fertile savannas, the Sahel, is a good indicator of the slow but steady desertification that is occurring.

Source: UNEP.

Of the 20 million beneficiaries of Lake Chad's water, 80-90% live off agriculture, livestock and fisheries. The dwindling of the region's lifeblood resource threatens it with food insecurity and conflict.

Libya, which used to be mostly non-desert in 1920, is now mostly desert, having experienced a 500 km advance of the Sahara during the dry season.

Mali is located in West Africa, straddling the Sahara so 65% of its area used to be desert or semi-desert. The country is plagued with conflict which is partly driven by climate change-worsened drought. The Sahara is growing at a rate of 48km per year in the area, exacerbating food insecurity and further feeding Mali's instability.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা /AI(Artificial Intelligence)

সোমাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কুশ কুমার পাইক, কঙ্কনা রায়েন

সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল মানুষের মত চিন্তা করতে পারে এমন মেশিন তৈরির বিজ্ঞান। এটি এমন কিছু করতে পারে যা "স্মার্ট" বলে বিবেচিত হয়। এই AI প্রযুক্তি মানুষের থেকে ভিন্ন উপায়ে প্রচুর পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে। AI এর লক্ষ্য হল প্যাটার্ন চিনতে , সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং মানুষের মতো বিচার করার মতো জিনিসগুলি করতে সক্ষম হওয়া।

ভূমিকা :

- কৃত্রিম বুদ্ধিবুদ্ধিমত্তা একটি কৃত্রিম ডিভাইসে বুদ্ধিমত্তার নকশার সাথে সম্পর্কিত।১৯৫৬ সালে জন ম্যাকার্থি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।
- বুদ্ধিমত্তা হল লক্ষ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা , বোঝা এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতা।
- AI হল গণনা মূলক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক অনুষদের অধ্যয়ন করা।
- AI হল গণনামূলক প্রক্রিয়া হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তিক/ মানসিক প্রক্রিয়াগুলির অধ্যয়ন।
- এ আই অনন্য , গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, দর্শন , মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্ঞানীয় বিজ্ঞান এবং আরও অনেক কিছু কাজ করায়।
- যদিও AI বা এমনকি বুদ্ধিবুদ্ধিমত্তার কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, তবে এটি একটি প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন মেশিন তৈরি করা যা মানুষের মতো চিন্তা করতে এবং কাজ করতে পারে , শিখতে এবং সমাধান করতে জ্ঞান ব্যবহার করতে সক্ষম।

এর ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান ধরনের এ আই রয়েছে –

- দুর্বল **AI**
- শক্তিশালী **AI**

  এবং
- সুপার **AI**

দুর্বল AI - একটি কাজে মনোনিবেশ করে এবং এর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনা (আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ)

শক্তিশালী AI - যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বুঝতে এবং শিখতে পারে যা একজন মানুষ করতে পারে (গবেষকরা শক্তিশালী AI তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন)

সুপার AI - মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যায় এবং যেকোন কাজ মানুষের চেয়ে ভালো ভাবে সম্পাদন করতে পারে (এটি এখনও একটি ধারণা)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা :

১. **মানুষের ত্রুটি হ্রাস**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি উল্লেখযোগ্য ভাবে ত্রুটি কমাতে পারে এবং নির্ভুলতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট। প্রতিটি পদক্ষেপে AI দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পূর্বে সংগৃহীত তথ্য যুক্ত এবং একটি নির্দিষ্ট অ্যালগরিদম দ্বারা নির্ধারিত হয়। সঠিকভাবে প্রোগ্রাম করা হলে , এই ত্রুটি গুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

২. **শূন্য ঝুঁকি**

AI এর আরেকটি বড় সুবিধা হল যে মানুষ AI রোবটকে আমাদের জন্য কাজ করতে দিয়ে অনেক ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে পারে। এটি একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করা, মহাকাশে যাওয়া , মহাসাগরের গভীরতম অংশগুলি অন্বেষণ করা হোক না কেন, ধাতব দেহযুক্ত মেশিনগুলি প্রকৃতিতে প্রতিরোধী এবং বন্ধুত্বহীন বায়ুমণ্ডলে বেঁচে থাকতে পারে। তদুপরি , তারা আরও বেশি দায়িত্বের সাথে সঠিক কাজ সরবরাহ করতে পারে এবং সহজে পরিধান করেনা।

৩. **২৪ x ৭ উপলব্ধতা**

এমন অনেক গবেষণা রয়েছে যা দেখায় যে মানুষ দিনে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘন্টা উৎপাদনশীল কাজ করতে পারে। মানুষেরও তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিরতির প্রয়োজন। কিন্তু AI বিরতি ছাড়াই অবিরাম কাজ করতে পারে। তারা মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত চিন্তা করে এবং সঠিক ফলাফল সহ একাধিক কাজ করে। এমনকি তারা এ আই অ্যালগরিদমের সাহায্যে ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি সহজেই পরিচালনা করতে পারে।

৪. **নতুন উদ্ভাবন**

কার্যত প্রতিটি ক্ষেত্রে , AI হল অসংখ্য উদ্ভাবনের পিছনে চালিকাশক্তি যা মানুষকে বেশিরভাগ চ্যালেঞ্জিং সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে।

উদাহরণ স্বরূপ, AI-ভিত্তিক প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি ডাক্তারদেরকে একজন মহিলার স্তন ক্যান্সার শনাক্ত করার অনুমতি দিয়েছে।

৫. **দৈনিক অ্যাপ্লিকেশন**

আজ, আমাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পূর্ণরূপে মোবাইল ডিভাইস এবং ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল। আমরা Google Maps, Alexa, Siri, Windows-এ Cortana, OK Google, সেলফি তোলা , কল করা , ইমেলের উত্তর দেওয়া ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করি। বিভিন্ন AI-ভিত্তিক কৌশল ব্যবহার করে, আমরা আজকের আবহাওয়াও অনুমান করতে পারি এবং সামনের দিনগুলোর পরিস্থিতিও জানতে পারি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অসুবিধা :

১. উচ্চ খরচ

মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ করতে পারে এমন একটি মেশিন তৈরি করার ক্ষমতা কোন ছোট কীর্তি নয়। এটির জন্য প্রচুর সময় এবং সংস্থান প্রয়োজন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে পারে । আপডেট থাকতে এবং সর্বশেষ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এ আই কে হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারও পরিচালনা করতে হবে , এইভাবে এটি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে।

২. কোন সৃজনশীলতা নেই

AI এর একটি বড় অসুবিসুবিধা হল এটি গতানুগতিক চিন্তার বাইরে চিন্তা করতে শিখতে পারেনা । AI প্রি - ফেড ডেটা এবং অতীত অভিজ্ঞতার সাথে সময়ের সাথে শিখতে সক্ষম, কিন্তু এর পদ্ধতিতে সৃজনশীল হতে পারেনা । একটি উদাহরণ হল- বট কুইল যিনি ফোর্বস আয়ের প্রতিবেদন লিখতে পারেন। এই রিপোর্টগুলিতে শুধুমাত্র ডেটা এবং তথ্য রয়েছে যা ইতিমধ্যে বট কে দেওয়া হয়েছে । যদিও এটি চিত্তাকর্ষক যে একটি বট নিজেই একটি নিবন্ধ লিখতে পারে , তবে ফোর্বসের অন্যান্য নিবন্ধগুলিতে এটির মানবিক স্পর্শের অভাব রয়েছে।

৩ . বেকারত্ব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি প্রয়োগ হল একটি রোবট, যা পেশাকে স্থানচ্যুত করছে এবং বেকারত্ব বাড়াচ্ছে (কিছু ক্ষেত্রে)। অতএব, কেউ কেউ দাবি করেন যে চ্যাটবট এবং রোবট মানুষের প্রতিস্থাপনের ফলে বেকারত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের মতো আরও কিছু প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবসায় মানব সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য রোবটগুলি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। যদিও এটি সর্বদা হয়না , কারণ এটি মানুষের জন্য কাজ করার অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানুষকে প্রতিস্থাপন করে।

৪. মানুষকে অলস করে তোলে

AI অ্যাপ্লিকেশনগুলি বেশিরভাগ ক্লান্তিকর এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে । যেহেতু কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের কিছু করতে হবেনা বা ধাঁধা সমাধান করতে হবেনা , তাই আমরা আমাদের মস্তিষ্ক কম ব্যবহার করার প্রবণতা রাখি । AI-তে এই আসক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে ।

৫ . <u>আবেগহীন</u>

শৈশবকাল থেকেই, আমাদের শেখানো হয়েছে যে কম্পিউটার বা অন্যান্য মেশিনের অনুভূতি নেই। মানুষ একটি দল হিসাবে কাজ করে , এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য টিম ম্যানেজমেন্ট অপরিহার্য। যাইহোক, এটা অস্বীকার করা যায়না যে কার্যকর্যরভাবে কাজ করার সময় রোবটগুলি মানুষের চেয়ে উচ্চতর, তবে এটাও সত্য যে মানুষের সংযোগ, যা দলগুলির ভিত্তি তৈরি করে , কম্পিউটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারেনা ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা , যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকৃত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন হয়ে উঠেছে একটি একাডেমিক শিক্ষার স্থান যেখানে পড়ানো হয় কীভাবে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করবে এমন কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার তৈরি করতে হয়।মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে ।কম্পিউটারকে মিমিকস কগনেটিক এককে আনা হয় যাতে করে কম্পিউটার মানুষের মত ভাবতে পারে । যেমন শিক্ষা গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) হল মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এ আই "বুদ্ধিবুদ্ধিমান এজেন্ট" -এর অধ্যয়ন হিসাবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে : যেকোনো যন্ত্র যা তার পরিবেশকে অনুধাবন করতে পারে এবং এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যা লক্ষ্য অর্জনে তার সাফল্যকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নেয়। যখন একটি মেশিন "জ্ঞানীয়" ফাংশনগুলিকে কার্যকর করে যা অন্যান্য মানুষের মনের সাথে মিল থাকে , যেমন "শিক্ষাগ্রহণ" এবং "সমস্যা সমাধানের" সাথে সংযুক্ত, তখন "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা " শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আন্দ্রেয়ার কাপলান এবং মাইকেল হেনলিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞায় বলেন "এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা , এমন তথ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং ঐশিক্ষা ব্যবহার করে নমনীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য করা।মেশিনগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে সক্ষম হয়ে উঠে তখন মানুষের সুবিধার জন্য বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞা থেকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয়।উদাহরণস্বরূপ, অপটিক্যাল অক্ষর স্বীকৃতিটি "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার" উদাহরণ হিসাবে আর অনুভূত হয়না , তখন এটি একটি নিয়মিত প্রযুক্তি হয়ে ওঠে। বর্তমানে যে সক্ষমতা গুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি মানুষের বক্তব্যকে সফলভাবে বুঝতে পারে , কৌশলগত গেম সিস্টেম (যেমনঃ দাবা) উচ্চতর স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে , স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িচালাতে পারে, সামরিক সিমুলেশন এবং জটিল উপাত্ত গুলো ব্যাখ্যা করতে পারে।

কৃষক চায় না কৃষিকাজ (ভারতে)

রনি দাস
সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

ভারতীয় সমাজে বহুদিন ধরেই চলে আসছে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা। কৃষক ফসল ফলায় সাধারণত নিজের ভরনপোষনের ও জীবিকা নির্বাহের জন্য। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, কৃষিকাজ কী? বা কৃষিকাজের সংজ্ঞা কী? অধ্যাপক জিমারম্যান এই বিষয়ে বলেছেন "জমিতে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী মানুষ যখন উদ্ভিদ ও প্রানী জীবনের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ব্যবহার, উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে নিজ প্রয়োজন পূরনে উদ্ভিদ ও প্রানীজ দ্রব্য উৎপাদন করে, তখন সেই উৎপাদনমুখী কর্ম প্রচেষ্টাকে কৃষিকাজ বলে"। ভারতে প্রধানত ধান ও গম সর্বাধিক উৎপাদিত হয়, এছাড়াও রয়েছে ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, মিলেট, শাকসবজি, কফি, চা, পাট, তুলা, আখ ইত্যাদি। ভারতে রাজস্থান এর থর মরুভূমি ও উত্তরের কিছু পার্বত্য অঞ্চলে ছাড়া অন্য সব রাজ্যে চাষাবাদ হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন

"আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে
সকাল হতে সন্ধে। "

এ কথা তৎকালীন সময়ে প্রজোয্য ছিল, কিন্তু বর্তমানের কৃষি ব্যবস্থা দেখলে হয়তো এই কথা বলতে তিনি শত বার ভাবতেন। বর্তমানে কৃষিকাজ এক যুদ্ধের সমান।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে, গ্রামীণ উন্নয়নকে চালিত করতে, রপ্তানির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছে কৃষিকাজ। ফলত, ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তা প্রদানে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু কৃষকের অবস্থা প্রায় ২০০ বছর আগে নীলচাষের সময় যেমন ছিল আজও তার পরিবর্তন
হয় নি।

ভারতে **'Gaon Connection Survey'** নামক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৪৮ % কৃষক কৃষিকাজ করতে চান না তারা কৃষক হিসেবে সামান্য সামাজিক সম্মানটুকুও পান না। বর্তমানে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অচ্ছুৎ এক শ্রেণী তাই একজন কৃষক তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এর থেকে দূরে রাখতে চান। এখন প্রশ্ন আসে কেন কৃষক নিজের কৃষিকাজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়?

তার উত্তরে আমরা তাদের কাছ থেকে জানতে পারি, কৃষক প্রথমে কোন ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নেয়, সেই ঋণের টাকায় ফসলের বীজ, কীটনাশক, রাসায়নিক সার কেনে, জমি কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করে। এটি একটি দীর্ঘ্য সময় ব্যাপী প্রক্রিয়া। এরপর উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করে যে অর্থ উপার্জন হয়, সেই অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে। উর্পাজিত অর্থের লভ্যাংশের দ্বারাই কৃষক নিজের জীবন নির্বাহ করে।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ফসল উৎপাদন করা একটা চ্যালেঞ্জ। এখন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে ফলে উষ্ণতার বৃদ্ধি পাচ্ছে।বিভিন্ন কীটনাশক উপদ্রপ বেরেছে, মাটির থেকে জল অধিক উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হচ্ছে যার কারণে মাটির আদ্রতা কমে যাচ্ছে। সার ও কীটনাশক, উচ্চ ফলনশীল বীজ এর মুল্য বৃদ্ধি ঘটেছে যা শস্য উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির মূল কারণ। তবে সেই অনুপাতে উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে তার অধিকাংশ অর্থই ব্যয় করতে হচ্ছে, চাষির কাছে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ লাভের অংশের পরিমাণ অনেক কম বা কিছুই থাকে না বললেই চলে। সেই অর্থ দিয়ে কৃষকের নিজের জীবন নির্বাহ ও সংসার খরচ চালানো হয়ে উঠেছে দূর্বিসহ।

ভারতীয় কৃষিকাজ অতিমাত্রায় মৌসুমি বায়ু নির্ভর হওয়ার কারণে মৌসুমি বায়ু আগে অথবা পরে এলে কৃষিকাজে ক্ষতি করে। এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অধিক বৃষ্টি ঘটলে তা বন্যা পরিস্থিতির প্রভাবে ফসল নষ্ট হয়। আবার শীতকালীন উত্তর পশ্চিম দিকে থেকে আসা পশ্চিমিঝঞ্ঝা ও ফসলের ক্ষতি করে।

কৃষিতে বিভিন্ন কারণে ক্ষতির ফলে শস্যের উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদিত শস্যের বাজার মূল্য না বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কৃষকের উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই চলে যায় নিজের জীবন নির্বাহ করতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তারা, তাই ঋণের বোঝা বারতে থাকে।

উপরিউক্ত কারণেই অনেক কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। ভারতে সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে প্রতি দিন গড়ে ৪০ জন কৃষকরা এখন আর কৃষিকাজ করতে চায় না। তারা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এর পরিনতি কিন্তু ভয়ংকর হতে পারে।

ভবিষ্যতের এই ভয়ংকর পরিনতি থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে প্রধান ফসলের উৎপাদন খরচ হিসাব করে তার সাথে কৃষকের লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রিমূল্য (MSP) স্থির করতে হবে। এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে শস্যের বীমা যেন কৃষক নির্দিষ্ট সময়ে পায় তার ব্যবস্থা সরকারকে করে দিতে হবে।

গ্লোবাল ওয়ারমিং

ঈশিতা মুখার্জী, স্বর্ণালী সাধুখাঁ, সৌমিলি বিশ্বাস, তৃপ্তি সাঁতরা

সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

" দাও ফিরে সে অরন্য - লও এ নগর ,

লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর সভ্যতা "।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ভুমিকা :

শতাব্দীর সূর্য যখন মধ্য - গগনে তখন সভ্যতার সর্বনাশী খেলার ফলশ্রুতিতে মানবজীবনে ঘনিয়ে আসে বিশ্ব উষ্নায়নের অভিশাপ । দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের হাত ধরে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও নির্বিচারে বৃক্ষ ফল হল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা। বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য বিভিন্ন হওয়ার বর্তমান যুগে উত্তরোত্তর উষ্নতার পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে । উষ্ণতার এই ক্রমবর্ধমান দশাই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বিশ্ব উষ্নায়ন বা গ্লোবাল ওয়ারমিং নামে পরিচিত ।

বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি গ্রীন হাউজ গ্যাস প্রকৃতিতে বজায় থাকে । কিন্তু কোন ভাবে তাদের পরিমান বেড়ে গেলে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকৃত রূপে ফিরে এসে বাড়িয়ে তোলে তার উষ্ণতা । উনিশ শতকের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ১ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেট করে বেড়ে গেছে ।

- কারণ :

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের অপরিমিত ভোগের চাহিদা, প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সর্বোপরি বিশ্বায়ন মানব সভ্যতাকে যেমন ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তেমনি পৃথিবীর উষ্মিকরনের সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প , ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন প্রভৃতি পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ হল -

১/ জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে CO_2 বৃদ্ধি

২/ জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যাবহারে CO_2 বৃদ্ধি

৩/ রঙ শিল্পে, ইলেক্ট্রোনিক্স শিল্পের থেকে CFC গ্যাস নির্গত

৪/ নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যাবহারের জন্য নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধি ।

- **ফলাফল** :

i) **পরিবেশের উপর প্রভাব** :-

১) অম্লবৃষ্টির সৃষ্টি :- সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, কলকারখানা ও জানবাহনের থেকে নির্গত গ্যাস প্রভৃতি বাতাসের অনু গুলির সাথে বিক্রিয়া করে অম্লবৃষ্টির সৃষ্টি করে। যার ফলে-

ক/ মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে

খ/ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে

গ/ বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ, মনুমেন্ট ও অট্টালিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে

২) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি :- বিগত ২৫০ বছরের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.৫ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেট বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে বাড়তে থাকলে আগামী ২১০০ খ্রিস্টাব্দে উষ্ণতা ১ থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেট বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। যার ফলে-

ক/ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে গ্রীষ্ম ঋতু দীর্ঘস্থায়ী হবে।

খ/ সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

গ/ হিমবাহের গলন শুরু হবে।

ঘ/ জলচক্রের পরিবর্তন হবে।

ঙ/ মরুভূমির সম্প্রসারন ঘটবে।

ii) **মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব** :-

অ) শতকরা ৫ ভাগ ওজোন স্তর অবলুপ্তির ফলে মানুষের ত্বকে ক্যানসার সংখ্যা প্রায় ২০ - ৬০ হাজার বেড়েই চলেছে।

আ) বাতাসে নাইট্রিক অক্সাইডের প্রাচুর্যের ফলে শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। নিউমোনিয়া, ফুসফুসে ক্যানসারের মত বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।

ই) বাতাসে প্রভূত পরিমানে ক্লোরিনের উপস্থিতি শ্বাসনালীতে প্রদাহ, চখের রোগ- কনজাংটিভা ও কর্নিয়ার ক্ষতি সহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঈ) তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, ভাইরাল এনকেফেলাইটিস, পীতজ্বর, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ক্রমাগত বাড়ছে।

- <u>বিশ্ব উষ্নায়নের প্রভাব নিয়ন্ত্রনের উপায়</u> :

১৯৬৫ তে আমেরিকার বিজ্ঞানী দের মধ্যে প্রথম বিশ্ব উষ্নায়নের ভয়াবহতা বিষয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়ে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেনেভা সম্মেলন, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে অপর এক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

সেই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদগন বিশ্ব উষ্নায়নের প্রভাব লক্ষ করে কয়েকটি নিয়ন্ত্রক ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন। সেগুলি হল -

ক) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাবহার হ্রাস।

খ) অপ্রচলিত শক্তির অধিক ব্যাবহার।

গ) ফ্রেয়ন গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ।

ঘ) বনসৃজন।

ঙ) প্রযুক্তিগত উন্নতি।

চ) আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ।

ছ) পরিবর্তিত ও বিকল্প দ্রব্যের ব্যাবহার।

জ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

ঝ) গবেষণায় উৎসাহ দান।

বিশ্ব উষ্নায়ন নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি ব্যাবস্থা, পারস্পারশিক সহায়তায় নানান প্রকারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্দ্যেশ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিরগমন বন্ধ করতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের মধ্যে একাধিক সম্মেলন ও চুক্তি সম্পাদন করেছে। ১৯৮৮ সালে 'টরেন্টোর সম্মেলন' বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে CO_2 নির্গমন ২০ % কমাতে বলা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাক্ষরিত হয় 'মন্ট্রিল প্রোটোকল' । প্রতি বছর প্রতিষ্ঠিত হয় জি - ৮ (G-8) সম্মেলন, গড়ে তোলা হয়েছে " গ্লোবাল ওয়ারমিং পোটেনশিয়াল" । ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে ' বসুন্ধরা আর্থ সামিট' এর অ্যাজেন্ডা - ২১ অনুসরন করতে বলা হয়।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা

বিদিশা হলদি, তারক পাল
সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

লোকেরা প্রায়শই স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা শব্দগুলিকে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যকে "সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।" WHO সুস্থতাকে "ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম অবস্থা " হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং সুস্থতাকে "জীবনের একটি ইতিবাচক পদ্ধতি " হিসাবে প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল স্বাস্থ্য হল লক্ষ্য এবং সুস্থতা হল এটি অর্জনের সক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রথমে সুস্থতা অর্জন না করে আপনি সত্যিই স্বাস্থ্য পেতে পারেন না। সুস্থতার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব রয়েছে , যা একটি শক্তিশালী , সুখী এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য বনাম সুস্থতা – যদিও আপনি স্বাস্থ্যের অবস্থা বেছে নিতে পারেন না , আপনি সচেতনভাবে আপনার জীবনকে দায়িত্বের সাথে যাপন করে এবং আপনার সুস্থসুতার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুস্থতা বেছে নিতে পারেন। স্বাস্থ্য একটি রোগ/অসুখের নির্ণয় , একটি রোগের প্রবণতা , এবং কোন অপ্রত্যাশিত আঘাতের অন্তর্ভুক্ত। সুস্থতা হল বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া যা আপনার পূর্ণস্বাস্থ্য এবং সুস্থতায় পৌছাতে পারে । এটি সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করা , পছন্দ করা এবং জীবনধারা পরিবর্তন করা , একজন ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে এমন ঝুঁকির কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা ,পুষ্টির উপর মনোনিবেশ করা, একটি সুষম খাদ্য থাকা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি অনুসরণ করার সাথে যুক্ত। ঝুঁকির কারণ হল এমন ক্রিয়া বা শর্ত যা একজন ব্যক্তির অসুস্থতা বা আঘাতের ঝুঁকি বাড়ায়। সু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন কিছু ঝুঁকির কারণ নিম্নরূপ:

- **ধূমপান:** এটি ফুসফুসের ক্যান্সার এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ।
- **অ্যালকোহল পান:** এটি লিভারের ক্ষতি , স্ট্রোক, হার্টের ক্ষতি করতে পারে, এবং ক্যান্সার হতে পারে।
- **অরক্ষিত যৌনতা :** এটি হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) সহ যৌনবাহিত রোগ ছড়ায়।
- **চরম শারীরিক কার্যকলাপ /খেলাধুলা:** এর ফলে হাড় ভাঙ্গা এবং অন্যান্য ধরনের আঘাত হতে পারে।সুস্থতা কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি কিছু,এটি সামগ্রিক এবং বহুমাত্রিক। এটি ছয়টি মাত্রা নিয়ে গঠিত যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা।

শারীরিক: শারীরিক সুস্থতা শারীরিক বল বাড়ায়- শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির অসুস্থতা এবং রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম সুস্থ মন ও শরীরকে উদ্দীপিত করে।

হাঁটা , সাইকেল চালানো , কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া , জগিং করা এবং হাইকিংয়ের মতো দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ করে একটি সুন্দর ও সতেজ জীবন কাটানো যায়। ভাল পুষ্টিকর , সুষম খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান করা (প্রতি দিন আট গ্লাস) এবং পর্যাপ্ত ঘুম একজন ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধি করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক : মানসিক ব্যায়াম শেখার মাধ্যমে কোন নতুন কিছু শেখার ইচ্ছ , সমস্যা সমাধান এবং সৃজসৃনশীলতা বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতা কে সমর্থন করে এবং একটি ভাল মনোভাব প্রচার করে । যারা নতুন জিনিস শিখে এবং তাদের মনকে চ্যালেঞ্জ করে তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে পারে। বিভিন্ন মানসিক চাপ, ডিপ্রেশন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান হয়।

আবেগপ্রবণ: মানসিক সুস্থতা সহ একজন ব্যক্তি যেকোনো প্রকার চাপের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারেন। যে ব্যক্তির তাদের নিজের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে এবং অন্যের অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি রয়েছে সেই ব্যাক্তি মানসিক সুস্থতা লাভ করেছেন।

পরিবেশগত: আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতিতে আমরা যে ভূমিকা পালন করি তা নিয়ে সচেতনতা এবং তার অমান্য করার পরিবর্তে সকলকে তা সম্পর্কে সচেতন করা এবং ঝুঁকি মুক্ত একটি স্বাস্থ্যকর শারীরিক পরিবেশে বজায় রাখতে এবং জীবনযাপন করা সুস্থতার প্রচার করতে উদ্যোগী হওয়া পরিবেশগত সুস্থতার প্রতিক।

সামাজিক: সামাজিক চেতনা এবং সমজগযোগ্য গুলি একজন ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অমূল্য। এবং একটি সম্প্রদায়ে অবদান, ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রাখা একজন ব্যক্তিকে সুখী এবং স্বাস্থ্যকর রাখে।

আধ্যাত্মিক: আধ্যাত্মিক সুস্থতা একজন ব্যক্তির ধর্ম বা বিশ্বাসকে বোঝায়না , তবে মানুষের অস্তিত্বের অর্থ এবং উদ্যেশ্য অনুসন্ধান করা। সহানুভূতি , যত্নশীল, ক্ষমা করা এবং জীবনের উদ্যেশ্য থাকা আধ্যাত্মিক সুস্থতায় সাহায্য করে । এটি ধ্যান, স্বেচ্ছাসেবক কাজ, প্রকৃতিতে সময় কাটানো ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।

একদিকে , দুর্বল স্বাস্থ্যের রোগীরা অসুস্থতার চিকিসার জন্য চিকিৎসা সম্প্রদায়কে নিযুক্তযু করে । অন্যপ্রান্তে , লোকেরা প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে মনোনিবেশ করে এবং তাদের জীবনী শক্তিকে সর্বাধিক করে তোলে। তারা এমন জীবনধারা গ্রহণ করে যা স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ,রোগ প্রতিরোধ করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান এবং সুস্থতার বোধ বাড়ায়। সুস্থতা সক্রিয়, প্রতিরোধমূলক এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য স্ব-দায়িত্ব দ্বারা চালিত।

US$1 বিলিয়ন প্রতি বছর ভ্যাকসিনের জন্য ব্যয় করা হয় যা প্রতি বছর ১ মিলিয়ন পর্যন্ত শিশুকে বাঁচাতে পারে । ১৯৯০ সাল থেকে , ভ্যাকসিনের জন্য ধন্যবাদ, প্রতিদিন ১৭০০০ কম শিশু মারা গেছে , কিন্তু ৬ মিলিয়নেরও বেশি শিশু এখনও প্রতি বছর তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা যাচ্ছে।

প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা : মজা , খেলা , চলাফেরা এবং সক্রিয় বিনোদনের প্রেক্ষাপটের মধ্যে , এই স্তরের শিক্ষার্থীরা সামাজিক-মানসিক সাক্ষরতা বিকাশ করতে শুরু করে , অনুভূতি গুলি পরিচালনা করতে , সম্পর্ক তৈরি করতে এবং অন্যদের আবেগ বুঝতে শেখে।

প্রাথমিক শিক্ষা: এই পর্যায়ে , শিক্ষার্থীরা মানসিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। তারা স্বাস্থ্যকর উপায়ে অনুভূতি প্রকাশ করার, মানসিক এবং শারীরিক চাপ পরিচালনা করার এবং প্রয়োজনে সহায়তা চাওয়ার প্রাসঙ্গিক ক্ষমতা বিকাশ করে। ফলস্বরূপ, সহনশীলতা , সম্মান এবং অন্যের পার্থক্য এবং আবেগ বোঝার প্রচার করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা : এই স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের কারণগুলি এবং পুষ্টি গ্রহণের গুণমান, পরিবেশগত কারণ এবং জীবনধারা পছন্দের মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে শেখা। গবেষণা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে , শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য এবং বৈষম্যকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলিকে সমালোচনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। সমান্তরাল ভাবে , তারা তাদের নিজস্ব পছন্দ এবং আচরণের পাশাপাশি অন্যদের পছন্দ এবং পরিস্থিতির জন্য তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য দায়িত্ব বিকাশ করে।

মাদক ও অ্যালকোহল অপব্যবহার এবং প্রতিরোধের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষার চাবিকাঠি। এটি পরিবার পরিকল্পনা , যৌন শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং তথ্য প্রদান করে।

সুস্থতা হল জীবনের সাথে সন্তুষ্টির অনুভূতি , স্বাস্থ্য , সুখ এবং সমৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত একটি রাষ্ট্র। সুস্বাস্থ্য মানবদেহের যত্ন এবং অসুস্থতা এবং নেশা থেকে রক্ষা করার জন্য যা করা যেতে পারে তার সমস্ত কিছুর সাথে সম্পর্কিত।

ভারত

রিসব সাঁতরা

দ্বিতীয় বর্ষ সাধারণ

ভারত যার সরকারি নাম ভারতীয় **প্রজাতন্ত্র** , দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র।ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। অন্যদিকে, জনসংখ্যার বিচারে এটি বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান উত্তর-পূর্বে চিন, নেপাল ও ভূটান এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও মায়ানমার অবিস্থত। এছাড়া, ভারত মহাসগারে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দ্রনেশিয়া হল ভারতের নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্র। দক্ষিণে ভারত মহাসগার, পসছিমে আরব সাগার ও পূর্বে বঙ্গপসগার দ্বারা বেষ্টিত ভারতের উপকূলরেখার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৭,৫১৭ কিলোমিটার (৪,৬৭১ মাইল)।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারাতের উপমহাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত। ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এখানেই স্থাপিত হয়েছিল বিশালাকার একাধিক সাম্রাজ্য। নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করত। হিন্দু, জৈন ও সিখ বিশ্বের এই চার ধর্মের উৎসভূমি ভারত। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে জরথুস্তিয় ধর্ম (পারসি), ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এ দেশে প্রবেশ করে এবং ভারতীও ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল নিজেদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেশ পুরোদস্তুর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়ে ওঠে। অতঃপর, এক সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত একটি স্বতন্ত্র রাস্ত্ররুপে আত্তপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

বর্তমানে ভারত ২৮টি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিশিষ্ট একটি সংসদীয় সাধারন্তন্ত্র। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বাজারি বিনিময় হারের বিচারে বিশ্বে দ্বাদশ ও ক্রয়ক্ষমতা সমতার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম। ১৯৯১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত আর্থিক সংস্কার নীতির ফলশ্রুতিতে আজ আর্থিক বৃদ্ধিহারের বিচারে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দ্বিতীয়।

❖ **উৎপত্তি**

ভারত নামটির উৎপত্তি চন্দ্রবংশীয় পৌরাণিক রাজা ভারতের নামানুসারে হয়েছিল। কথিত আছে এই *বর্ষ* বা অঞ্চলটি রাজা ভরতকে দান করা হয়েছিল বলে এর নাম *ভারতবর্ষ*। *ভারত* শব্দটি, ভারতীয় মহাকাব্য ও

ভারতের সংবিধান উভয়েই উল্লিখিত, অনেক ভারতীয় ভাষায় শব্দটি ভিন্নতর উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। এটি ঐতিহাসিক নাম *ভারতবর্ষ*এর একটি আধুনিক উপস্থাপনা, যা মূলত উত্তর ভারতে প্রযোজ্য, *ভারত* উনবিংস শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ভারতের একটি স্থানীয় নাম হিসেবে বর্ধিত প্রচলন অর্জন করে।

অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুসারে ইংরেজি" ইন্ডিয়া" নামটি ধ্রুপদী ল্যাটিন শব্দ ইন্দিআ থেকে নেয়া হয়েছে, এটি দক্ষিণ এশিয়া এবং এর পূর্ব দিকের একটি অনিশ্চিত অঞ্চল কে উল্লেখ করে। শব্দটি ধারাবাহিকভাবে। হেলেনিস্টিক গ্রীক ভাষায় ইন্দিআ, প্রাচীন বিগবাশাই ইন্দোস, প্রাচীন ফার্সি ভাষায় আকিমীনিয় সাম্রাজ্যের একটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে হিন্দুশ এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গোত্রীয় সংস্কৃত শব্দ হিন্দু থেকে উদ্ভূত হয়, *সিন্ধু*শব্দটি দ্বারা বিশেষত **সিন্ধু নদ** ও এর জনবসতি যুক্ত দক্ষিণ অববাহিকাকে উল্লেখ করা হয়। প্রাচীন গ্রিকরা ভারতীয়দের *ইন্দোই* হিসাবে উল্লেখ করেছিল, যার বঙ্গানুবাদ হল "সিন্ধু অঞ্চলের মানুষ"।

❖ <u>ইসিহাস</u>

<u>প্রাচীন ভারত</u>

মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ভীমবেটকা প্রস্তর ক্ষেত্র ভারতে মানববসতি প্রাচীনতম নির্দেশন। এক লক্ষ বছর আগেও এখানে মানুষের বসবাস ছিল। প্রায় ৯০০০ বছর আগে এদেশে স্থায়ী মানববসতি গড়ে উঠে; যা কালক্রমে পশ্চিম ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিন্ধু সভ্যতার আনুমানিক সময়কাল ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এরপর ভারতে বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগেই হিন্দুধর্ম তথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব ঘটে। বৈদিক যুগের সমাপ্তিকাল আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। আনুমানিক ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাজনপদ নামে অনেকগুলি স্বাধীন রাজতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক রাজ্য।

<u>মধ্যযুগীয় ভারত</u>

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ নামে আখ্যাত হয়। এছাড়া পূর্ব ভারতে পাল এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্ক, চোল ও বিজয়নগর প্রভৃতি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সকল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শন সমৃদ্ধি লাভ করে।

উত্তর ভারত প্রথমে **সুলতানি** ও পরে **মুঘল সাম্রাজ্যের** অন্তর্ভুক্ত হয়।মহামতি আকবরের রাজত্বকালে দেশে একাধারে যেমন সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা হয়, তেমনই প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সম্প্রীতি।ক্রমে ক্রমে মুঘল সম্রাটগণ উপমহাদেশের এক বৃহৎ অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। যদিও **উত্তর-পূর্বাঞ্চলে** প্রাধান্যকারী **অসমের অহম** রাজশক্তি এবং আরও কয়েকটি রাজ্য মুঘল আগ্রাসন সফলভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল।

<u>প্রারম্ভিক আধুনিক ভারত</u>

ষোড়শ শতক থেকে পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপীয় শক্তিগুলি ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতেও সক্ষম হয়।

আধুনিক ভারত

১৮৬৫ সালের মধ্যেই ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল। এর এক বছর পরেই ঘটে ভারতীয় সিপাহি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত এক জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তা দেশে কোম্পানির শাসনের দুর্বলতার দিকগুলি উন্মোচিত করে দেয়। তাই ভারতকে আনা হয় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ত্যক্ষ শাসনাধীনে।

❖ ভূগোল

ভারতীয় মহাদেশের সিংহভাগ নিয়ে গঠিত ভারতীয় ভূখণ্ডটি ভারতীয় টেকটনিক পাত ও ইন্দ্র-অস্ট্রেলিয়া মধ্যস্থিত একটি গৌণ পাতের উপর অবস্থিত। এই ভূখণ্ড গঠনের প্রধান ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি শুরু হয় আজ থেকে ৭৫ কোটি বছর পূর্বে, যখন দক্ষিণের অতিমহাদেশ গন্ডয়ানার অংশ হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তর-পূর্ব দিকে সরতে শুরু করে। তৎকালীন অসংগঠিত ভারত মহাসাগারব্যাপি এই সরণ স্থায়ী হয় ৫০ কোটি বছর। এর পরে উপমহাদেশটির সঙ্গে ইউরেশীয় পাতের সংঘর্ষ ঘটে এবং উপমহাদেশের পাতটি ইউরেশীয় পাতের তলায় অবনমিত হয়ে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা হিমালয়ের উত্থান ঘটায়। এই পর্বতমালা বর্তমানে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক বেষ্টন করে আছে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদীগুলির মধ্যে প্রধান গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। উভয়েই বঙ্গপসাগারেপতিত হয়েছে। গঙ্গার প্রধান উপনদীগুলি হল যমুনা ও কোশী নদী। কোশী নদীতে নাব্যতা অত্যন্ত কম থাকায় প্রতি বছর ভয়াল বন্যা দেখা দেয়। উপদ্বীপের প্রধান নদীগুলি হল গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা ও কাবেরী। এই নদীগুলির খাত অত্যন্ত নাব্য হওয়ায় বন্যা কম হয়ে থাকে। এই নদীগুলিও বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে নর্মদা ও তাপ্তি পতিত হয়েছে আরব সাগরে। ভারতীয় উপকূলভূমির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিম ভারতে কচ্ছের রাণ ও পূর্বভারতে সুন্দরবনের পলিগঠিত বদ্বীপ অঞ্চল, যা ভারত ও বাংলাদেশে বিস্তৃত। ভারতে দুটি দ্বীপপুঞ্জ দেখা যায়: ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলভাগের নিকটে প্রবালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান সাগারের আগ্নেয় দ্বীপমালা আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ।

জলবায়ু

ভারতের বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাদানগুলি দেশের জলবায়ুকে অনেকাংশেই প্রভাবিত করে। কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের মাঝবরাবর প্রসারিত। কিন্তু দেশের উত্তর সীমান্ত বরাবর অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা মধ্য এশিয়া থেকে আগত ক্যাটাবেটিক বায়ুপ্রবাহকে প্রতিরোধ করে দেশে ক্রান্তীয় জলবায়ু বজায় রাখতে সহায়তা করে। হিমালয় পর্বতমালা ও থর মরুভূমি দেশে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রণ করে।ভারতে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়: শীত (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি), গ্রীষ্ম (মার্চ থেকে মে), বর্ষা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর), এবং শরৎও হেমন্ত (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর)। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ণের ফলে ভারতের জলবায়ুতে নানাপ্রকার অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য

বহু ভারতীয় প্রজাতি গন্ডোয়ানায় জাত টেক্সা থেকে উদ্ভূত। উপদ্বীপীয় ভারতের ক্রমসরণ ও ইউরেশীয় ভূমিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রজাতিগুলির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও অগ্ন্যুৎপাত ও অন্যান্য জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বিগত ২ কোটি বছরে বহু দেশজ প্রজাতিই অবলুপ্ত হয়ে যায়।এর ঠিক পরেই দুটি প্রাণীভৌগোলিক পথে উত্থানশীল হিমালয়ের দুই পাশ দিয়ে ভারতে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রবেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের মোট স্তন্যপায়ী ও পাখিদের যথাক্রমে মাত্র ১২.৬% ও ৪.৫% দেশজ; যেখানে দেশের সরীসৃপ ও উভচরদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫.৮% ও ৫৫.৮%। উল্লেখযোগ্য দেশীয় প্রাণী হল নীলগিরি লাঙ্গুর, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বাদামি ও গাঢ় লাল রঙের বেডোমি ব্যাঙ। ভারত ১৭২টি (২.৯%) আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ -গণিত লুপ্তপ্রায় প্রাণীর আবাসস্থল। এর মধ্যে রয়েছে এশিয় সিংহ, বাংলা বাঘ ভারতীয় শ্বেতপৃষ্ঠ শকুন (বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত)।

❖ রাজনীতি ও সরকার

রাজনীতি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৯৬-১৯৯৮ সালটি কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থিরতার যুগ। এই সময় একাধিক স্বল্পকালীন জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য বিজেপি সরকার গঠন করে। তারপর কংগ্রেস ও বিজেপি-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ক্ষমতা দখল করে। এই সরকারই ভারতের প্রথম পূর্ণ সময়কালের অকংগ্রেসি সরকার।

❖ অর্থনৈতিক

১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ভারত **সমাজতান্ত্রিক** -ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে চলে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অধিকাংশ সময় জুড়ে ভারতে যে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে বেসরকারি উদ্যোগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর কঠোর সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত থাকত। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভারত তার বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর সরকারি কর্তৃত্ব শিথিল করা হয়।

❖ জনপরিসংখ্যান

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র। ২০১৮ সালে দেশটির আনুমানিক জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি। ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার প্রায় ১৭.৭৪ শতাংশ। সাম্প্রতিক কালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজার জনে ১১.১০ জন বা ১.১১ শতাংশ। গড়ে প্রতি দুই সেকেন্ডে জনসংখ্যা একজন করে বাড়ে। যদিও সাম্প্রতিক দশকগুলিতে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে শহরাঞ্চলীয় জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি প্রায় ৬৬.৮০ শতাংশ ভারতবাসী গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। জনসংখ্যার ৩৩.২০ শতাংশ শহরে বসবাস করে। এ দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতি ৪৫৫ জন।

ভাষা ও ধর্ম

ভারতের দুটি প্রধান ভাষা গোষ্ঠী হল ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়। ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা হিন্দি এবং সহকারী সরকারি ভাষা ইংরেজি প্রশাসন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। শুধুমাত্র হিন্দি বা ইংরেজি নয় অর্থাৎ সাংস্কৃতিক তামিল তেলেগু বাংলা ভাষা ও আরো বিভিন্ন ভাষা রয়েছে। ভারতের উপভাষার সংখ্যা ১, ৬৫২ টি। ১১০ কোটিরও বেশি ভারতবাসী হিন্দু, যদিও হিন্দু বলতে সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসরত সকলকেই বোঝায়। শুধুমাত্র হিন্দু নয় ভারতের মধ্যে রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায় খ্রিস্টান, শিক, বৈধ, যৌন, আদিবাসী ও অনান্য প্রভৃতি ধর্মের মানুষ।

❖ সংস্কৃতি

আফ্রিকা মহাদেশের পরে ভারত সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতিগতভাবে বিশ্বের সর্বাধিক বৈচিত্রপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল। এই সংস্কৃতি স্বকীয় ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক আক্রমণকারী ও বহিরাগত জাতিগুলির থেকে গ্রহণ করা রীতিনীতির সমন্বয়, সংস্কৃতি ,ঐতিহ্য ও ধারণা অঙ্গীভূত হয়ে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

স্থাপত্য

ভারতীয় স্থাপত্য এমন একটি বিষয় যার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় রূপ ধরা পড়ে, তাজমহল ও অন্যান্য মুঘল স্থাপত্য নির্দেশন তথা দ্রাবিড় স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সম্মিলন লক্ষ করা যায়। ভারতের স্থানীয় স্থাপত্যশৈলিগুলিও দেশের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক স্থাপত্য-বৈচিত্র্যের সাক্ষী।

পরিবেশন শিল্পকলা ও সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র

ভারতীয় সংগীতের জগৎটি গঠিত হয়েছে ধ্রুপদী ও আঞ্চলিক সংগীত ধারায় সংমিশ্রণে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত দুটি ধারায় বিভক্ত -উত্তর ভারতের হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত এবং দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকে সংগীত। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীত হিন্দি গান বাউল গান প্রকৃতি লোকসংগীত। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য প্রথমে মৌখিকভাবে ও পড়ে লিখিত আকারে প্রচলিত হয় এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেদ , ভারতীয় মহাকাব্যরামায়ণ ও মহাভারত। আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে ১৯১৩ সালে দেশের প্রথম সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র শিল্প। হিন্দি সিনেমা বলিউড বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়াও বাংলা মালায়ালাম মারাঠি তামিল তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় ঐতিহ্যবাহী চলচ্চিত্র শিল্পের আছে।

পোশাক , উৎস্ খেলাধুলা, , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভারতের পোশাকের ঐতিহ্য রঙ ধরানো জলবায়ুর মতন বিভিন্ন কারণে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন।মহিলাদের পোশাক হচ্ছে শাড়ি, পুরুষের পোশাক ধুতি বা লুঙ্গি। এছাড়া সেলাই করা পোশাকের মধ্যে মহিলাদের সালোয়ার কামিজ ও পুরুষদের কুর্তা পাজামা প্রভৃতি। ভারতের উৎসব প্রকৃতিগতভাবে ধর্মীয়। ভারতে অনেক ধর্ম ও জাতি নিরপেক্ষ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হচ্ছে পূজা পার্বণ এগুলির মধ্যে দুর্গাপূজা, দীপাবল্, রথযাত্রা, গনেশ চতুর্থ, হোলি প্রবৃতি উৎসব মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদুল আযহা , ঈদুল ফিতর, খ্রিস্টানদের বড়দিন ও বুদ্ধ জয়ন্তী। ভারতের তিনটি জাতীয় উৎসব পালিত হয় এগুলি হল স্বাধীনতা দিবস সাধারণ তন্ত্র দিবস ও গান্ধী জয়ন্তী। ভারতের সুনির্দিষ্ট জাতীয় খেলা নেই। ভারতের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের খেলা হয়ে থাকে যেমন– ফুটবল্, ক্রিকে্, কাবাড়ি, হকি এছাড়াও মহিলা ও পুরুষদের জন্য অলিম্পিক গেমও হয়ে থাকে।

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অতি প্রাচীনকাল থেকে তার নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে এসেছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় ধাতুবিদগণ দিল্লি লৌহ-স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি যতদিন যাচ্ছে ততই আরো উন্নতি ঘটছে এবং বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান যত সামগ্রী আরো গড়ে তুলছে।

ভারত একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানাটা আবশ্যক। সময়ের চলমানতায় মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

মহামারী

আসমাতারা খাতুন
সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

চলছিল বেশ স্বাভাবিক জীবন - যাপন
আসেনি বহুদিন কোনো ঝড় তেমন ;
সাধারণ ছিল মানুষের চলার ধরন
উন্নতির শীরায় ছিল দেশের উন্নয়ন ,
বোঝেনি মানুষ অভাব তখন
হতে পারে এক নিমেষে জীবন ধংস এমন ;
এলো হে মহামারী যখন ।।
আকাশ যেন কেমন ফ্যাকাসে
মেঘ গুলো খাসা - ঠাসা।
বস্তাপচার ময়লা ধোঁয়ায়
পৃথিবীটা গেল বদলে ,
এসে গেল ‘কোভিড - যুদ্ধ’
মানবিক পৃথিবীতে।।
বোবা - কালা - মুখদর্শন
সবাই তখন একই জীবন রেখায় ;
দিনের আলোয় আঁধারের দিবানিদ্রায়
তুষারে ঢেকেছে শয্যায়।।
করোনা তুমি এসেছ কেন ?
এই ধরণীর বুকে ;
তোমার জন্য হয়েছে বিবর্ণ
চিনের হাসিমুখ ,
স্কুল - কলেজ বন্ধ সব
বন্ধ বেলুর মঠ ।।
করোনা তুমি বিদায় হও
নিয়ে আমার যাতনা ,
আকাশে হয়ে যাও বিলীন তুমি
এই করি প্রার্থনা ।।

শিক্ষামূলক আবশ্যিক ভ্রমণ- পূর্ব সিকিম, 2023

বিভাগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিক্ষামূলক আবশ্যিক ভ্রমণ- পূর্ব সিকিম, 2023

বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে Quiz এ অংশগ্রহণ

শিক্ষামূলক আবশ্যিক ভ্রমণ- পুরুলিয়া, 2022

শিক্ষামূলক আবশ্যিক ভ্রমণ- কোপাই,2022

জাতীয় নারী দিবস উৎযাপন বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের তৈরী ভারতের ম্যাপ

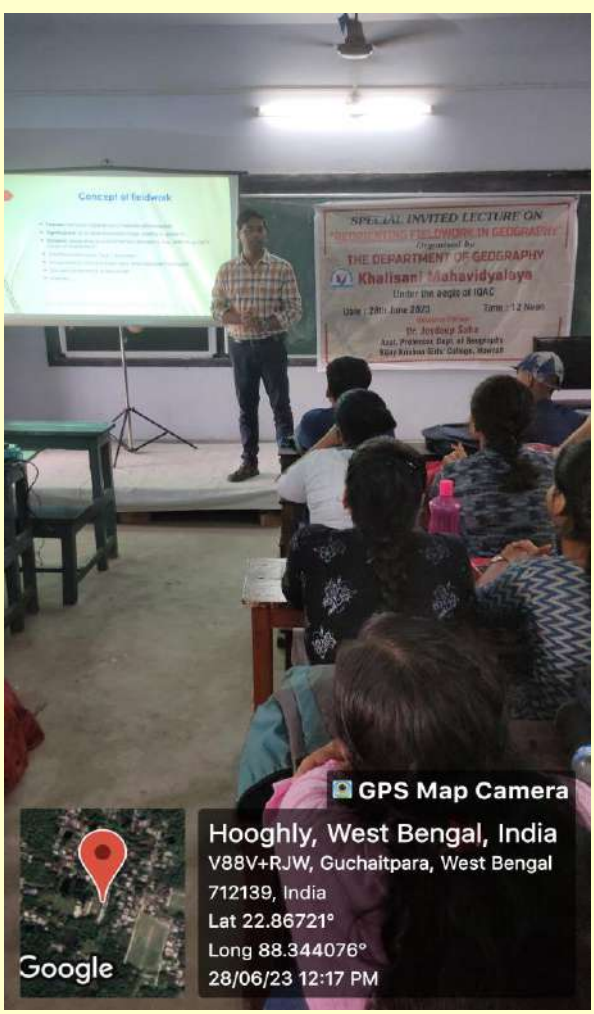

বিভাগীয় সেমিনার – “Reorienting Fieldwork in Geography” দেওয়াল পত্রিকা 'উর্বী -11 ' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

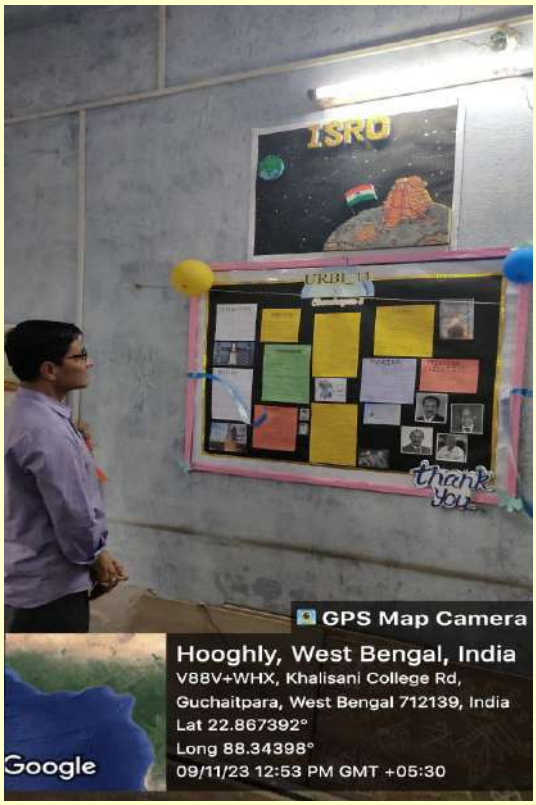

দেওয়াল পত্রিকা 'উর্বী -11 ' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিভাগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

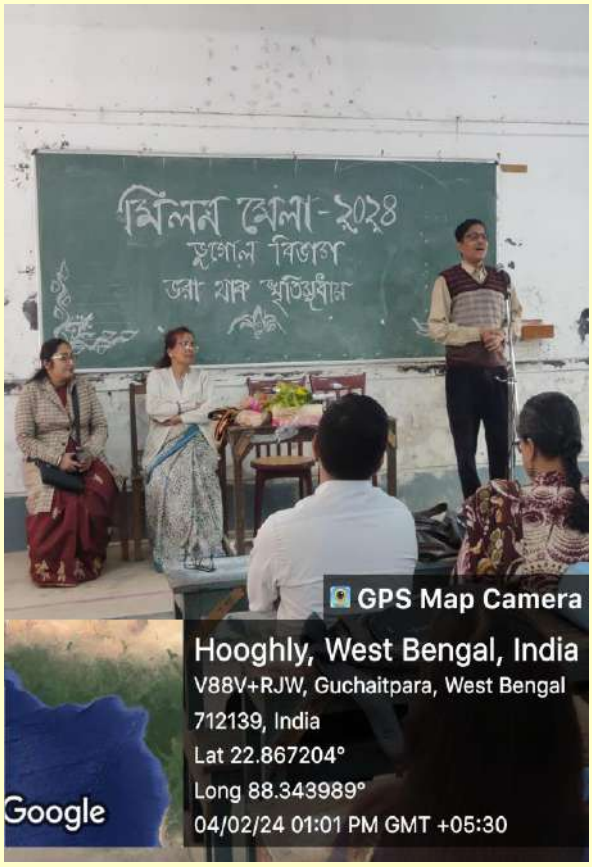

বিভাগীয় মিলন মেলা 2024

বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের তৈরী কলেজ স্কেচ

বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের TCS BPS এ প্লেসমেন্ট

Contact us:

Department of Geography

Khalisani Mahavidyalaya

Affiliated to The University of Burdwan

Email: kmv.dept.geo@gmail.com

Khalisani, Chandannagar, District: Hooghly

West Bengal, 712138